পরিশেষ পদ্ধতি(Method of Residues)

পরিশেষ পদ্ধতির যে সংজ্ঞা যুক্তিবিদ্ মিল্ দিয়েছেন তা হল ঃ কোন ঘটনার যে অংশকে পূর্বেই আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে পূর্ববর্তী ঘটনার নির্দিষ্ট কার্য হিসেবে জানা গেছে, সেই অংশকে সমগ্র ঘটনা থেকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে, তা অবশিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনার কার্য। (Subtract from any phenomenon such as is known by previous inductions to be the effect of certain antecedents, and the residue of the phenomenon is the effect of the remaining antecedents)।

একটি কার্যের অনেক অংশ থাকতে পারে। আবার ঐ কার্যটি যে কারণ থেকে উৎপন্ন তার আবার অনেকগুলি অংশ থাকতে পারে। এখন ধরা যাক, কার্যের এই অংশগুলির মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের কারণ আমরা পূর্ব থেকে জানি। কার্যের সেই অংশটির কারণ, কারণের নির্দিষ্ট কোন্ অংশটি, ঐ তথ্য আমরা জানতে পারব যদি আমাদের আগে জানা থাকে যে, কার্যের বাকী অংশ কারণের কোন্ বাকী অংশ থেকে উৎপন্ন।

পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কারণ-কার্য সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে আমাদের তিনটি শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এগুলি হল ঃ

১) কার্য বা কারণটিকে একটি মিশ্র কার্য (বা মিশ্র কারণ) হতে হবে। অর্থাৎ অনেকগুলি কার্যকে (অনেকগুলি কারণকে) একসঙ্গে উৎপন্ন হতে হবে। কোন একক কার্যের ক্ষেত্রে পরিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।

২) এই মিশ্র কার্যকে (বা মিশ্র কারণকে) সমজাতীয় হতে হবে। কার্যটির কিছু অংশের সাথে এক ধরণের কারণের কিছু অংশের সম্পর্ক আছে, একথা বলা মানে ধরে নিতেই হবে যে কার্যের এই অংশগুলির মধ্যে একধরনের মিল আছে, অর্থাৎ অংশগুলি একই ধরনের।

৩)কার্যের (বা কারণের) যে অংশগুলির কারণ(বা কার্য) আগেই জানা আছে তা কোন আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে হবে। অর্থাৎ দুটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পরিশেষ পদ্ধতিকে তখনই প্রয়োগ করা যাবে যদি ঘটনা দুটির ক্ষেত্রে আগেই অন্যান্য আরোহীমূলক পদ্ধতির যে কোন একটিকে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

পরিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিসূত্র ঃ

১) যা কোন কার্যের কারণ বলে জ্ঞাত তা অন্য কোন কার্যের কারণ নয়।

২) যদি জানা থাকে যে, কোন(যৌগিক) পূর্বগের একটি নির্দিষ্ট অংশ এর (যৌগিক) অনুগটির একটি নির্দিষ্ট অংশের কারণ , তাহলে সিদ্ধান্ত করা যায় - পূর্বগটি বাকি অংশ অনুগটির বাকি অংশের কারণ (বা অনুগটির বাকি অংশ পূর্বগটির বাকি অংশের কার্য)। বলা বাহুল্য প্রথমটি হল বর্জনের সূত্র আর দ্বিতীয়টি হল গ্রহণের সূত্র।

পরিশেষ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঃ

১) পরিশেষ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অন্যান্য আরোহ পদ্ধতির ওপর নির্ভর না করে পরিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। কেননা, কার্যের যে অংশের কারণ পূর্বে জ্ঞাত, এখানে 'পূর্বে জ্ঞাত' বলতে 'আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমেই জ্ঞাত' বুঝতে হবে।

২) এক্ষেত্র যে কার্যটি কারণ নির্ণয় করতে হবে, তা একটি মিশ্র কার্য অর্থাৎ অংশ বিশিষ্ট কার্য হতে হবে।

৩) মিল তাঁর পরিশেষ পদ্ধতির সূত্রে কেবলমাত্র ('phenomenon') বা 'ঘটনা' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। ঘটনা বলতে তিনি কার্যকেই বুঝিয়েছেন। তাহলে মনে করতে হবে যেন মিল-এর মতে অনুসন্ধানের বিষয় একমাত্র কার্য। অর্থাৎ পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে যেন কারণ থেকে কার্যকেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখানে ঘটনা বলতে কার্য বা কারণ যে কোন একটি অর্থকেই বোঝাতে পারে। ফলে পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কারণ থেকে কার্যকে যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি কার্যথেকে কারণকেও অনুমান করা যায়।

৪) পরিশেষ পদ্ধতিতে কোন্‌টি কারণ নয় তা যেমন নির্ণয় করা যায়, তেমনি কোন্‌টি কারণ তাও নির্ণয় করা যায়। যে সূত্রটির সাহায্যে কারণ নির্ণয় করা যায় তা হল - কোন যৌগিক পূর্ববর্তী ঘটনার (যৌগিক অর্থাৎ

অনেকগুলি অংশবিশিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনা) কোন অংশ যৌগিক অনুবর্তী ঘটনা (অর্থাৎ মিশ্র বা অনেক অংশ বিশিষ্ট অনুবর্তী ঘটনা) কোন্ অংশের কারণ - এ তথ্য যদি পূর্বে জানা থাকে তাহলে পূর্বগের বাকি অংশ ঐ অনুগের বাকি অংশের কারণ। এই নিয়ম প্রয়োগ করে পরিশেষ পদ্ধতিতে কী কারণ তা নির্ণয় করা যায়। তাই এটিকে গ্রহণের সূত্রও বলা যেতে পারে।

পরিশেষ পদ্ধতির সাংকেতিক রূপ বা আকার ঃ

	পূর্বগ	অনুগ
	R S T	s t u
জানা আছে,	S	t-এর কারণ
জানা আছে,	T	u-এর কারণ,

সুতরাং R হল s-এর কারণ, বা
s হল R-এর কার্য ।

এ রূপটিকে আরও সংক্ষেপে এভাবেও দেখানো যায়।

	পূর্বগ	অনুগ
প্রথম দৃষ্টান্ত ঃ	R S T	s t u
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঃ জানা আছে,	S T	t u-এর কারণ(কেননা S-এর, t-এর, T u-এর, কারণ)

সুতরাং R হল s-এর কারণ, বা
s হল R-এর কার্য।

পরিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিসুত্রের প্রথমটি প্রয়োগ করে জানা যায়, S s-এর কারণ নয়(কেননা, জানা আছে, S t-এর কারণ), আবার T s-এর কারণ নয় (কেননা, জানা আছে, T u-এর কারণ)। আর দ্বিতীয় অংশটি প্রয়োগ করে জানা গেল ঃ R-এর কার্য হল s বা s-এর কারণ হল R ।

বাস্তব দৃষ্টান্ত ঃ

পূর্বগ		অনুগ
পণ্যদ্রব্য-বোঝাই একটি গাড়িকে তৌলযন্ত্রের ওপর স্থাপন করা	হলে	ওজন নির্দেশের কাঁটার ৫০-এর মণ নির্দেশক-দাগ পর্যন্ত ঘোরে।
জানা আছে, খালি গাড়ীটিকে তৌলযন্ত্রের ওপর স্থাপন করা	হলে	ওজন নির্দেশক কাঁটার ৩০-মণ নির্দেশক-দাগ পর্যন্ত ঘোরে।
সুতরাং পণ্যদ্রব্যগুলি তৌলযন্ত্রে ওপর স্থাপন করা	হলে	ওজন নির্দেশক কাঁটার (৫০ - ৩০ বা) ২০-মণ নির্দেশক দাগ পর্যন্ত ঘোরে।

উক্ত উদাহরণটিকে আমরা আরও সহজে এভাবেও ব্যক্ত করতে পারি ঃ

মাকসহ গাড়ির ওজন নিয়ে দেখা গেল, ওজন ৫০ মণ,
আগেই জানা আছে, গাড়িটির ওজন ৩০ মণ;
সুতরাং মালের ওজন ২০ মণ।

পরিশেষ পদ্ধতির দুটি রূপ ঃ

প্রথম রূপ যা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা হল।

দ্বিতীয় রূপ ঃ

অনেক সময় দেখা যায়, কোন (যৌগিক) কার্যের এক অংশের কারণ জানা গেল, অন্য অংশের কারণ জানা গেল না। এ রকম ক্ষেত্রে পরিশেষ পদ্ধতির দ্বিতীয় রূপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই দ্বিতীয় রূপের সাহায্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ঠিক; কিন্তু এটি কার্যের অন্যান্য অংশের কারণ অনুসন্ধানে সহায়তা করে। পরিশেষ পদ্ধতির এ রূপটি নিম্নরূপ ঃ

মনে করার হেতু আছে, -এর কারণ
জানা আছে, -এর কারণ
জানা আছে, -এর কারণ

সুতরাং কারণ-সংযোগের মধ্যে -এর কারণ নেই

সুতরাং -এর কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করার দরকার।

এরূপটি যে সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাহল এরূপ ঃ

যদি কোন যৌগিক কার্যের অংশ বিশেষ জ্ঞাত-কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হয় তাহলে এর জন্য কোন অতিরিক্ত কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় রূপটিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয় না। এ রূপটি প্রয়োগ করে আমরা জানতে পারি, অমুক যৌগিক কার্যের অমুক অংশের কারণ অনুসন্ধান করার দরকার। এজন্য এরূপটিকে অ-ব্যাখ্যাত ব্যাপারের নির্দেশক অঙ্গুলি সংকেত বলে বর্ণনা করা হয়। পরিশেষ পদ্ধতির এরূপটি প্রয়োগ করে, অনেক সময় বিজ্ঞানীরা কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কারণ সম্পর্কে প্রকল্প প্রণয়ন করেন, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে প্রকল্পটির সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে, অর্থাৎ কারণ আবিষ্কার করতে, সমর্থ হন। বলা যায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে আছে পরিশেষ পদ্ধতির দ্বিতীয় রূপটি। আমরা এখন নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকগণ কিভাবে পরিশেষ পদ্ধতির দ্বিতীয়রূপ প্রয়োগ করে করেছেন তা দেখে নেব।

নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার ঃ

১৮২১ সালে ইউরেনাসসহ বিভিন্ন গ্রহের গতির একটি সারণী প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সারণীর উপাত্ত(data) গুলিকে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এখানে গ্রহগুলির অবস্থান ও গতির যে গাণিতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তার সাথে তৎকালীন অনেক জোতির্বিদ্‌ই ভিন্ন মত পোষণ করেন। বস্তুত, সারণীর উপাত্ত অন্য সবগুলি গ্রহের অবস্থান ও গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও ইউরেনাস গ্রহটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ইউরেনাসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গাণিতিক আলোচনার সূত্রপাত হয়।

১৮৪৫ সালে বিজ্ঞানী ল্যাভেরিয়া (Leverrier) এই সমস্যাটির সমাধানে সচেষ্ট হন। তিনি পূর্ববর্তী সারণীটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করে সারণীটিকে শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এক্ষেত্রে তিনি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সম্ভবত ইউরেনাস গ্রহের কক্ষপথে অন্য কোন গ্রহের অবস্থান রয়েছে, যা ইউরেনাসের গতিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। ১৮৪৬ সালে তিনি তাঁর এই পরীক্ষণটি সমাপ্ত করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর অনুরোধে বিজ্ঞানী গ্যালে (Galle) আকাশের ঐ নির্দিষ্ট স্থানে নতুন গ্রহ হিসেবে নেপচুনকে আবিষ্কর করেন যার দ্বারা ইউরেনাসের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতির ব্যাখ্যা মেলে।। এই সিদ্ধান্তের মূলে আছে কিন্তু পরিশেষ পদ্ধতি।

এক্ষেত্রে কোন যৌগিক কার্যে অংশবিশেষ জ্ঞাত-কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হওয়ায় অন্য কোন অতিরিক্ত কারণ-এর অনুসন্ধান অর্থাৎ ইউরেনাসের কক্ষচ্যুতির কারণ হিসেবে নেপচুনের আবিষ্কার।

পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ঃ

১) যুক্তবিদ্ মিল নিজে এই পদ্ধতির সুবিধার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আবিষ্কারে যে-সব পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে পরিশেষ পদ্ধতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতির সাহায্যেই অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। যেমন রেডিয়াম, নেপচুন গ্রহ ও আরগন গ্যাসের আবিষ্কার অন্যতম। সুতরাং আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির মূল্য অপরিসীম।

২) মিল আরও বলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যত পদ্ধতি আছে, অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করার পক্ষে এই পদ্ধতি সবচেয়ে ফলপ্রসু।। কেননা এই পদ্ধতি প্রায়ই আমাদের কারণ-কার্যের পারম্পর্য সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে, বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে কারণ ও কার্য এতখানি দৃষ্টি আকর্ষক নয় যে, তা নিজে থেকেই পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

৩) পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে একদিকে যেমন কারণ থেকে কার্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে কার্য থেকে কারণের দিকেও অগ্রসর হওয়া চলে। সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রদ। ব্যতিরেকী পদ্ধতি এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

৪) পরিশেষ পদ্ধতি অন্যান্য আরোহ পদ্ধতির পরিপূরক। কারণ সব আরোহ পদ্ধতিই কম বেশী পরিশেষ পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। কেননা যতটুকু জানা আছে, সেই জানা অংশটুকুকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের কার্য বা কারণ নির্ণয় করাই সকল আরোহ পদ্ধতির লক্ষ্য।

৫) পরিশেষ পদ্ধতি বহুকারণের সম্ভাবনাকে অনেকাংশে দূর করতে পারে।

পরিশেষ পদ্ধতির অসুবিধা ঃ

১) এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল পদ্ধতিটি অবরোহমূলক। যেহেতু

ক) এখানে সিদ্ধান্তটি মূল জটিল বিষয় থেকে বাদ দিয়ে তবেই অনুমান করা হয়। এই বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াটি কিন্তু অবরোহমূলক।

খ) পরিশেষ পদ্ধতির দৃষ্টান্তটির সাথে অতিরিক্ত হেতুবাক্য যোগ করলেই সম্পূর্ণ অবরোহ অনুমানের আকার নেয়।

গ) এখানে ব্যাপকতর হেতুবাক্য থেকে কম ব্যাপক সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। জটিল ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ কারণ বা কার্য ধরে নিয়ে তার অংশবিশেষের কারণ অথবা কার্য নির্ণয় করা হয় বলে সিদ্ধান্ত হেতুবাক্য থেকে কম ব্যাপক হয়।

তবে উক্ত কারণগুলি দর্শালেও পরিশেষ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে অবরোহ পদ্ধতি বলা যায় না। কারণ, অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হয়, কিন্তু পরিশেষ পদ্ধতির সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। অবশিষ্ট কারণ যে অবশিষ্ট কার্যের কারণ হবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এখানে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তা কখনই বৈধ অবরোহ নয়। কারণ, বৈধ অবরোহে কখনও হেতুবাক্য সত্য অথচ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু পরিশেষ পদ্ধতিতে এমন সম্ভাবনা থাকে যে হেতুবাক্য সত্য হলেও সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে। আবার এক বা একাধিক হেতুবাক্য প্রয়োগ করলেই পরিশেষ পদ্ধতিকে অবরোহ যুক্তির আকার দেওয়া যায় এ কথা কেবল পরিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে খাটে না। কম-বেশী অন্যান্য আরোহ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও হেতুবাক্য যোগ করে অবরোহ পদ্ধতির আকার দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পরিশেষ পদ্ধতিকে যেমন প্রকৃত আরোহী পদ্ধতি বলা যায় না, তেমনি প্রকৃত অবরোহী পদ্ধতি বলা যায় না। সেজন্য এই পদ্ধতিকে অবরোহী-আরোহী পদ্ধতি বলা হয়।

২) পরিশেষ পদ্ধতি অন্যান্য আরোহী পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। তাই এই পদ্ধতি কখনও স্বনির্ভর হয়ে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারে না।

৩) এই পদ্ধতি একটি মিশ্র কার্যের (বা মিশ্র কারণের) এক অংশের কারণ (বা কার্য) বলা থাকলে তবেই বাকি অংশের কারণ (বা কার্য) নির্ণয় করতে পারে। মিশ্র কার্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ফলপ্রদ হলেও অমিশ্র কার্যের অর্থাৎ বিষমজাতীয় কার্য বা কারণ সংমিশ্রনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ফলপ্রসু নয়।

৪) পরিশেষ পদ্ধতিকে আবিষ্কারের পদ্ধতি বলা যায় না। নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার কখনও এই পদ্ধতির দ্বারা হয় নি। তার পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের দুটি অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। (ক) নিউটনের মহাকর্ষ নিয়ম (খ)

ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতির কারণ অন্যান্য গ্রহগুলি নয়। এই দুটি অনুমানের ওপর নির্ভর করলেও পরিশেষ পদ্ধতি কেবল এইটুকু বলতে পারে বাকী গ্রহগুলি ইউরেনাসের কক্ষপথের বিচ্যুতির কারণ নয়। কিন্তু ঠিক্ কোন্‌টি কারণ, তার একটি সঠিক নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিতে অর্থাৎ আবিষ্কার করতে পারে না।

৫) পরিশেষ পদ্ধতি প্রমাণের পদ্ধতিও নয়। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে এই পদ্ধতি কার্য-কারণ সম্পর্কের ইঙ্গিত মাত্র তাহলেও এ সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারে না। আবিষ্কৃত নেপচুন গ্রহটিই যে ইউরেনাসের বিচ্যুতির কারণ - এ তথ্য পরিশেষ পদ্ধতি প্রমাণ করতে পারে না।

৬) আবার যদিও কেউ কেউ এই পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক বলে মনে করেন, যেহেতু তাদের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এক্ষত্রেও বলা যায় যদি আমরা দুটি পদ্ধতির গঠনগত দিকটি খুঁতিয়ে লক্ষ্য করি তাহলে অনেক পার্থক্যও দেখতে পাব। তাই ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়।

৭) পরিশেষে বলা যায়, এই পদ্ধতি যে অপসারণ সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই সূত্রটিও সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত নয়। এক্ষেত্রে অপসারণ সূত্রটি হল ঃ যা একটি ঘটনার কারণ বলে জ্ঞাত তা অন্য ঘটনার কারণ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু আবার, একটি কারণের যেমন অনেকগুলি সহকার্য থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে কোন ঘটনা যদি একটি কার্যের কারণ হয় তাহলে সেটি অন্য(সহ) কার্যেও কারণ হতে পারে।